Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Tathkalin O Samakalin Samaje Narir Abasthan O Adhikar

তৎকালীন ও সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার

Swarnali Mukhopadhyay

স্বর্ণালী মুখোপাধ্যায়

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার ক্যাটেগরি ১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, কলকাতা

সারাংশ

একবিংশ শতাব্দীতে যখন মানুষ বিজ্ঞান, কলা ,সাহিত্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি সাধন করেছে; শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি যখন চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, তখনও সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের দেশে নারী-পুরুষের অনাকাঙ্খিত প্রভেদ বিদ্যমান। বৈদিক যুগে নারীরা সমাজের শিখরে অধিষ্ঠান করতেন , তৎকালীন সমাজের নীতি নির্ধারকগণ মনে করতেন 'যেখানে নারীরা সম্মানিত হন,সেখানে ঈশ্বর অবস্থান করেন।' অথচ ,আধুনিক কালে, সর্বক্ষেত্রে চরম উন্নত সমাজে আজও নারীরা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, অবহেলিতা। প্লেটো, এরিস্টটল, সেন্ট অগাস্টিন ,সেন্ট টমাস একুইনাস,এমানুয়েল কান্ট,রুশো প্রমুখ প্রথিতযশা দার্শনিকগণ এই বিভেদের পক্ষে সহমত পোষণ করতেন। তাই আমি এই স্বল্প পরিসরে, উল্লেখিত দার্শনিকগণের 'সমাজে নারী-পুরুষের বিভেদমূলক তত্ত্বের' এবং এই ঘৃণ্য বিভেদের সম্ভাব্য কারণগুলি আলোচনা করেছি। কিভাবে শুধুমাত্র নারী নয় বা কেবলমাত্র পুরুষ নয়, শুধুমাত্র মানুষের এক বিভেদহীন সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় - তারই জন্য সচেষ্ট হয়েছি।

বিষয়-সূচক শব্দাবলী : সমাজ, নারী, অবস্থান, অধিকার

মূল লেখা

মহাকবি কালিদাস 'মহাকবি' হওয়ার প্রাক্কালে রাজকন্যার একটি আঙ্গুল দর্শানোর উত্তরে দুটি আঙ্গুল দেখিয়েছিলেন। কালিদাস যে অভিপ্রায়েই দুটি আঙ্গুল দেখিয়ে থাকুন না কেন বিদুষী রাজকন্যা বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় হলেও তিনি দুইটি পৃথক সত্তায় বিরাজ করেন। তার একটি হলো 'পুরুষ' এবং অপরটি হলো 'প্রকৃতি' । অর্থাৎ পুরুষ যেমন ঈশ্বরের একটি সত্তা ও তাঁর প্রকাশ, প্রকৃতি বা নারীও ঈশ্বরের অপর এক সত্তা ও তাঁর প্রকাশ।

নারী সত্তার অপরিহার্যতা সৃষ্টির আদিস্থলে , যার বিহনে সৃষ্টির গতি ও ধারাবাহিকতা- সবই স্তব্ধ হয়ে যাবে।পশুপাখি,গাছপালা, কীট পতঙ্গ, জীব জন্তু অর্থাৎ সমগ্র জীব জগৎ এমনকি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টিও স্তব্ধ হয়ে যাবে। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বীকার্য যে সৃষ্টির সূচনায় প্রকৃতি বা নারীর যেমন ভূমিকা রয়েছে , পুরুষেরও রয়েছে সমান ভূমিকা। কিন্তু সৃষ্টির উত্তরকালে নারীর ভূমিকা, সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার মূলে তার যে সক্রিয় অবদান, তা একান্ত নারীরই। শুধু তাই নয়, নারী তার শরীরে ধারণ করে সৃষ্টিকে, শত প্রতিকূলতার মাঝেও সে রক্ষা করে উত্তরসূরিকে। জন্ম দেয় নবসৃষ্টিকে - ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকে চলমান রাখতে ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। অথচ আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও নারীকে বারংবার তার যোগ্যতা প্রমাণে অবতীর্ণ হতে হয়। আজও সারা বিশ্বে নারীকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবহেলিত হতে হয়।

পৃথিবীতে শোষণের সূত্রপাত ঘটেছিল ,মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতার আবিষ্ট জনজীবনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, শক্তিশালী গোষ্ঠী , তুলনায় দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে নানা ভাবে শোষণ করতো । অতীতে নারীগোষ্ঠী পুরুষ গোষ্ঠী দ্বারা,সমাজ দ্বারা যেমন শোষিত হতো, আজও তেমনই শোষণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কম আবার কোথাও বেশি। তবুও নারীরাই এই সমাজের অঙ্গে অঙ্গে মিশে থাকে জননী রূপে, পত্নী রূপে - সমাজের নানাবিধ ঝড় ও প্রতিকূলতা সামলে সমাজকে ধারাবাহিকতায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব , স্বার্থপরতা,হীনমন্যতা এমনকি কোনোরকম বিপ্লব তাকে অবদমিত করতে পারেনি।

নারীদের মর্যাদা , অধিকার ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই , সেখানে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা হয়েছে। ঔচিত্য - অনৌচিত্যের প্রসঙ্গে সমাজ তাত্ত্বিকগণের মধ্যে বাদানুবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, সেখানে পুরুষের মর্যাদা সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি বা অনুপস্থিত কেন? অর্থাৎ পুরুষদের মর্যাদাসংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আসছে না কেন ? এর থেকেই স্পষ্ট যে নারী ও পুরুষের মর্যাদাগত অবস্থানে নারীদের স্থান কত নগণ্য।

ভারতবর্ষ একটি প্রথাসর্বস্ব দেশ, যেখানে নারীরা প্রথা প্রতিপালনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে অবস্থান করে। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে নারীদের 'দেবী' হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংসার ও সমাজের সৌন্দর্য বিধানে , এমনকি শত্রু নিধনেও নারীদের ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। প্রাচীন সমাজের নীতি নির্ধারকগণ মনে করতেন যেখানে নারীরা সম্মানিত হন , সেখানে ঈশ্বর অবস্থান করেন। পুরুষেরা রাষ্ট্রের যে মর্যাদা পায় , নারীরা সমভাবে তার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও- তা পায় না। নারীদের মাতৃ পরিচয়ের বাইরেও একটি পরিচয় আছে, এবং সেই পরিচয় হল 'মানুষ'- তা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেনে নিতে পারে না। পুরুষেরা বিশ্ব জুড়ে কেবলমাত্র নিজেদের অধিকারকেই 'মানুষের অধিকার' বলে ঘোষণা করেছে। অথচ নারীর জন্য হয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যবস্থা, নারীর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হতো, সে শিক্ষা আদর্শ স্ত্রী ও মাতা হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 'নারী প্রশ্ন' একটি ইস্যু (issue) হিসাবে দেখা যায়, কিন্তু ১৯৭০ এর দশকে এই ইস্যুটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। এর মূল কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি আমেরিকা ও ইউরোপে Women's Liberation Movement (WLM) এর শুরু হওয়া। বিগত শতকের শেষ দিক থেকে কেবল উন্নত দেশগুলিতে নয়, এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও নারীজাগরণের সূচনা হয়েছে। সারা পৃথিবীর নারী সমাজ আর্থ সামাজিক,রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে পুরুষের সম অধিকার দাবী করছে। কাজেই নারীপ্রশ্ন আজ স্থানীয় ও জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। আজ তা আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে।

নারীবাদ বা 'Feminism' কথাটি ১৮৮০ র দশকে ফরাসী শব্দ 'femme' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই শব্দের অর্থ হলো woman বা নারী। 'ism' বা 'বাদ' যুক্ত করে 'feminism' বা 'নারীবাদ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকে Charles Fourier 'Feminism' শব্দটি আবিষ্কার করেন।

১৯৭০ থেকে নারীবাদী দর্শন স্বতন্ত্র রূপ নিতে শুরু করে। সত্তরের দশক থেকে উঠে আসা নারী আন্দোলনের নতুন জোয়ার 'New Wave Feminism' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তার আগে নারী আন্দোলন মূলত দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৭০ এ তার সঙ্গে যুক্ত হলো সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও জেহাদের সঙ্গে যুক্ত হলো concept বা ধারণার স্তরে পরিবর্তনের দাবী। ফলত activism বা সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে একটা নতুন বৌদ্ধিক মাত্রা পাওয়া গেলো।

নারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নারীমুক্তি। পুরুষের মতোই বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সমান অধিকার অর্জন। নাগরিক,সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ মূলক আচরণ- তারই অবসান ঘটানো।

ইউরোপে বস্তুতপক্ষে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ থেকে নারীদের অধিকার সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই সময়েই উদারপন্থী, সমতাবাদী (Equalitarian) এবং সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণার পরিস্ফুরণ ঘটে। এবার তা বুর্জোয়া থেকে আরম্ভ করে কৃষককুল, শহরাঞ্চলে শ্রমিক ও নারীদের মধ্যে প্রসারিত হয়। নারীর সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা অঙ্কুরিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০) ফলে মেয়েরা ক্রমান্বয়ে রুজিরোজগারের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বেরোতে থাকে। বিভিন্ন কলকারখানায় শিশু ও নারী শ্রমিক সেই সময় নিযুক্ত হয়। পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি সময় কাজের বিনিময়ে কম মজুরি পেত। ফলে প্রথমে ব্রিটেনে ও পরে আমেরিকায় মহিলারা সংগঠিত হতে থাকে বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করার জন্যে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। ১৭৮৩ সালে Mary Wollstonecraft (1759-1797) লন্ডনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার প্রায় ১০ বছর পর ১৭৯২ এ Wollstonecraft মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে একটি বই লেখেন যার নাম 'A Vindication of the Rights of Women'। এর ঠিক এক বছর আগে (১৭৯১) Olympe de Gonges (1784-1793) তাঁর 'Declaration of the Rights of Women' বইটিতে সরকারের চোখে, আইনের চোখে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকারের দাবী রাখেন। Wollstonecraft তাঁর বইতে লিখেছেন- নারী সমান অধিকার লাভের জন্যে সংগ্রাম করছে অথচ সর্বতোভাবে তার সংগ্রামী ক্ষমতা হারিয়েছে- তার শিক্ষা নেই, রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, সে গৃহস্থালির দায়ভার ক্লিষ্ট। Wollstonecraft মনে করেছিলেন যে এমন নির্বল গোষ্ঠীর প্রতিবাদ পরিণামহীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমেরিকায় নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরে। সেই সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে। ১৮৩৩ সালে মহিলাদের প্রথম প্রকাশ্য সভা বর্ণবিদ্বেষীদের আক্রমণে পন্ড হয়। এরপর ১৮৪০ এ ব্রিটেনের দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আয়োজিত কনভেনশনে শুধু পুরুষ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণে অধিকার ছিল না।

ব্রিটেন ও আমেরিকায় অষ্টাদশ শতক থেকে এক এক করে নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, নিজের উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অধিকার ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ব্রিটেনে এই তিনটি মৌলিক অধিকার আদায় হয়েছে তিন প্রজন্মের সংগ্রামের ফলে। ভারতের মহিলাদের ভোটাধিকার হয় ১৯২৯ এ। এই ভোটাধিকারে তিনটি শর্ত যুক্ত ছিল। এক, নারীকে বিবাহিত হতে হবে; দুই, তাকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে, এবং তিন, তাকে শিক্ষিত হতে হবে। [1]

নারীবাদী আন্দোলনের মূল ধারাগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান ধারা হলো :

ক)উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism)

খ) চরমপন্থী নারীবাদ (Radical Feminism)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজে নারীবাদের অধস্তন অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। উদারপন্থী নারীবাদের উদ্ভব এখান থেকেই ঘটে। টমাস হবস (Thomas Hobbs), জন লক (John Locke), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রমুখ চিন্তাবিদরা ছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল প্রবক্তা।

সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য লিবারাল নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬ তে একটি সংগঠন (NOW: National Organization for Women) তৈরি করে তাঁদের দেশে রিপাব্লিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে আট-দফা দাবি পেশ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে যেন নারী-সমাজের এই নিম্নলিখিত দাবি গুলিকে রাজনৈতিক দলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে -

১) সংবিধান-সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান;

২) নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করা;

৩) কর্মক্ষেত্রে ম্যাটারনিটি লিভ (Maternity Leave) এর অধিকার এবং সোশ্যাল সিকিউরিটির (Social Security) সুবিধা;

৪) কর্মরত অভিভাবকদের শিশু এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করে ছাড় দেওয়া;

৫) শিশুদের দেখাশোনার জন্য ক্রেশ (Creche) নির্মাণ;

৬) সমান শিক্ষা এবং একই প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের অধিকার (Co-education);

৭) কর্মক্ষেত্রে সমান প্রশিক্ষণের অধিকার এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা;

৮) মহিলাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার (Reproductive Rights);

'NOW' আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। ম্যারিটাল রেপ (Marital Rape) বা বৈবাহিক ধর্ষণ যা আজ আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে - তা এই অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আমেরিকায় চরমপন্থী বা র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্ম হয় ১৯৬৭ সালে। চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেননা যে 'Anatomy is Destiny.' তাঁরা শারীরিক বৃত্তিকে সম্পূর্ণ যুক্তির নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব খারিজ করে দেন।তাঁদের মতে আমাদের যৌন-পরিচয় যেমন আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়কে প্রভাবিত করে, তেমনি আবার আমাদের লিঙ্গ পরিচয় আমাদের যৌন -পরিচয়ের বিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ , আমাদের জন্মগত স্বরূপ বা Nature এবং আমাদের রচিত স্বরূপ বা Gender এর মধ্যে একটা উভমুখী সম্বন্ধ রয়েছে।

চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যে আইনের মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থার আপাত উন্নতি সাধিত হলেও মূল সমস্যাটা অপরিবর্তিত থেকে যায়। তাই এঁদের আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সচেতন হয়ে ওঠার প্রকল্প। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মেয়েরা তাদের অনুভবের কথা পরস্পরকে বলে। মনে করা হয় এটাও এক ধরণের সক্রিয় রাজনীতি। পরস্পরের সাথে কথা বলে এটা বোঝার চেষ্টা করা হয় কোনটি পিতৃতন্ত্রের কথা আর কোনটা মুক্তির স্বর। কবিতা, গল্প , পথনাটিকা ,সাহিত্যসভা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনমানসেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

আধুনিক কালে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও নারীবাদের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারীবাদী দর্শন পাঠের বৈশিষ্ট্য হলো, লিঙ্গ-ভাবনার নিরিখে দর্শনের নতুন পাঠ। নারীবাদী দর্শনের প্রথম পর্বে,অতীতের দার্শনিকগণের চিন্তা-ভাবনা থেকে তাঁদের লিঙ্গ -বৈষম্যকারী মনোভাব চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই জাতীয় মনোভাব চিত্রিত করা সম্ভবপর হবে।

দার্শনিক প্লেটো (Plato c 428-347 BC) তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে ভবিষ্যৎ অভিভাবকদের যে প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা দিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন যে - শিক্ষানবীশদের নারীর ভূমিকা অনুকরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। সে নারী বয়স্কই হোক বা অল্প বয়সীই হোক। যে নারী স্বামীর নিন্দা করে তাকে অনুকরণ করা উচিত নয় বা যে নারী সুখের বড়াই করে বা যে নারী দুঃখে বিহ্বল বা দুর্ভাগ্যহত কিংবা যে প্রেমাসক্ত অথবা অসুস্থ বা গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করছে তাকেও অনুকরণ করা উচিত নয়। প্লেটো বলেছেন -'' so these charges of ours, who are to grow up into men of worth, will not be allowed to enact the part of a woman, old or young railing against her husband, or boasting of a happiness which she imagines can rival the God's or overwhelm with grief and misfortune, much less a woman in love or sick, or in labour. ''[2]

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের (Aristotle c. 384 –322 BC) লেখার মধ্যেও লিঙ্গ বৈষম্যসূচক উক্তি পাওয়া যায়। তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন পুরুষ ও নারী-উভয়েরই মনের বিভিন্ন অংশ আছে,তাদের যৌক্তিক নিয়ামক অংশ আছে এবং অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রিত অংশও আছে; কিন্তু বিভিন্ন জনের মধ্যে তা বিভিন্ন ভাবে আছে। যেমন ক্রীতদাসের বিচার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের বিচার ক্ষমতা থাকলেও কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং সে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তাঁর বক্তব্য হলো- ''All these persons [free man & slave, male & female, adult & child] possess In common the different parts of the soul [namely, the rational/ruling and the irrational /ruled elements]; but they possess them in different ways . The slave is entirely without the faculty of deliberation; the female indeed possesses it, but in a form which remains inconclusive [akuron, lacking in authority]; and if children also possess it, it is only in an immature form]]". [3]

অথচ এই এরিস্টটলকে দর্শনের ইতিহাসে সময়ের প্রবক্তা রূপেই স্মরণ করা হয়। কারণ, তিনি সব মানুষের মধ্যে র‍্যাশনালিটি, রূপ-অনুগত সামান্য ধর্ম স্বীকার করেন। অথচ, র‍্যাশনাল হয়েও যে নর ও নারী,প্রভু ও দাসের, যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র-তাঁর এই প্রকার পরস্পরবিরোধীমূলক মন্তব্য তেমন প্রাধান্য পায় না।

মধ্য যুগের দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিনের লেখা থেকে তৎকালীন সমাজ ও নারীর অবস্থান বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। তিনি বলেন যে , কেবলমাত্র পুরুষেরাই ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসাবে তৈরি। নারীরা হচ্ছে তাঁর মতে আংশিক প্রাণী। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিরূপকে একটি বিশেষ যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত করে দেখেছিলেন। কারণ, নারীরা কম আধ্যাত্মিক। তাদের যে সামাজিক অবস্থান তার কারণ নারীরা প্রকৃতিগত ভাবেই সাংবেদনিক। পুরুষরা যুক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি আসক্ত। সেজন্যই নারীদের অবস্থান তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও সীমাবদ্ধতার জন্য শুধুই পুরুষের কর্মের সহায়ক।

মধ্যযুগের আরো একজন ধর্মযাজক এবং দার্শনিক সেন্ট টমাস এয়্যকুনাস ছিলেন এরিস্টটলের অনুগামী। এরিস্টটল ও এয়্যকুনাস- উভয়ের মতেই সমাজে নারীদের অধস্তন অবস্থান, তাদের প্রকৃতি থেকে অনুসৃত। প্রকৃতি অনুযায়ী নারীরা পুরুষের চেয়ে হীনতর। এরিস্টটলের অভিমত হচ্ছে যে নারীদের দৈহিক গঠনের জন্যেই তারা পুরুষদের চেয়ে হীনতর। এয়্যকুনাস আরো বলেন যে, নারীরা হচ্ছে সমস্ত পাপের কারণ এবং সেইজন্য সমাজে তাদের অধস্তন স্থানই হওয়া উচিত। সবসময় স্বামীর অনুগত হওয়া তাদের কর্তব্য। [4]

ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'Observations on the Feeling of the Beautiful & Sublime' বইটিতে লিখেছেন যে , নারীদের কোনো উচ্চ দর্শন নেই , তারা ভীরু , তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য। এবং শুধু তাই নয়,নারীরা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের অক্ষমতার জন্য কুণ্ঠিত নয়।নারী সুন্দর, সে মুগ্ধ করে এবং সেটাই যথেষ্ট। 'A

woman is embarrassed little that she does not possess certain high insights, that she is timid, and not fit for serious employments, and so forth, she is beautiful and captivates, and that is enough........" [5]

যে কান্ট Categorical Imperative বা নিঃশর্ত আদেশ অনুসারে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন প্রত্যেক মানুষকে তার যুক্তিবাদী বৌদ্ধিক ক্ষমতার জন্য যথাযথ মর্যাদা দেখাতে হবে। তিনি আবার নারীদের সম্বন্ধে তাঁর 'Observations on the Feeling of the Beautiful & Sublime' গ্রন্থে লিখেছেন যে নারীদের জ্যামিতি শিখে কাজ নেই , তার 'পর্যাপ্ত যুক্তি ' বা 'মোনাড' বিষয়ে ঠিক ততটুকু জানলেই হবে যতটুকু জানলে পুরুষদের 'সেন্সর' করা নীরস বিদ্রুপের মূল বিষয়টা সে অনুধাবন করতে পারে। দার্শনিক ডেকার্টের তত্ত্ব তাদের কষ্ট করে না বুঝলেও চলবে।

''A woman therefore will learn no geometry, of the principle of sufficient reason or the monads, she will know only so much as is needed to perceive the salt in a satire which the insipid guilts of our sex have censured . The fair leave Descartes his vortices to whirl for ever without troubling themselves about them ......" [6]

দার্শনিক রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক বলা হয়। তিনি সকল মানুষের সাম্য,মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রুশো স্বাধীনতা বলতে শুধু পুরুষের স্বাধীনতাকেই বুঝিয়েছেন। নারীর স্বাধীনতার কথা বলেননি। তাঁর মতে নারীদের সমাজে যে অধস্তন অবস্থান, তা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ব্যাপার। নারীরা যে গর্ভধারণ করে, তাও তাদের প্রকৃতিগত। কেননা কেবলমাত্র নারী প্রজাতি সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং সে জন্য সমস্ত বিষয়ে তাদের পুরুষের অধীনে থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত তাদের যৌনতার ক্ষেত্রে তারা পুরুষের অধীন, তাছাড়া নারীরা অধিকতর লজ্জাবতী।এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের মঙ্গলকর উদ্দেশ্যে নারীদের উচিত লজ্জা এবং যৌন সংযম অভ্যেস । পুরুষকৃত আইনের বিরুদ্ধে বা নারী-পুরুষের অসমতার বিরুদ্ধে নারীদের অভিযোগ করা অন্যায়।

উপরোক্ত দার্শনিকগণের আলোচনা থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য মূলক চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁদের মতে পুরুষরাই হলো ঈশ্বরের প্রতিরূপ। সেই সঙ্গে দার্শনিকগণ শুধুমাত্র পুরুষদেরই যৌক্তিক জীব বলে অভিহিত করেছেন। উল্লিখিত দার্শনিকদের মতে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় হীনতর। দার্শনিক কান্ট্ তাঁর 'Categorical Imperative' বা নিঃশর্ত আদেশ অনুসারে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মানুষকে(পুরুষ-নারী নির্বিশেষে) তার যুক্তিবাদী বৌদ্ধিক ক্ষমতার জন্য যথাযথ মর্যাদা দান করতে বলেন। কিন্তু দার্শনিক কান্ট্ তাঁর দর্শনে শুধুমাত্র পুরুষদেরই 'যৌক্তিক জীব' বা 'Rational' বলে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধিক বা যৌক্তিকতা গুণটি তিনি নারী সমাজের প্রতি অস্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে দার্শনিক কান্ট্ নিজেই নিজের মতবাদ কে খণ্ডন করে সুস্পষ্টভাবে স্ববিরোধী মতের অবতারণা করেছেন।

জন রলসের (2002-1921 ,John Rawls) মতে, যুক্তি অনুসরণ করে চলাটাই ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার একমাত্র উপায়। মানুষ চায় সর্বতোভাবে যুক্তির দ্বারা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এটাই লিবারাল ভাবধারার মূল কথা , লিবারাল নারীবাদও সেই পথই অনুসরণ করে। তাঁরা মনে করেন , সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে কোনো একটা নীতি মেনে কাজ করতে, তাহলেই কাজটা ন্যায্য হবে, পক্ষপাত দোষ এড়ানো যাবে। উদার পন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যুক্তি বা reason এর কোনো লিঙ্গ পরিচয় নেই। মানুষ যখন যুক্তি ব্যবহার করে, তখন সে তার ব্যক্তিগত লিঙ্গ

পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'নারী অথবা পুরুষ' এই পরিচয়ের অতিরিক্ত আমাদের প্রত্যেকের একটা পরিচয় আছে - তা হলো আমরা মানুষ। আর এই মানুষ হওয়ার দরুণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যৌক্তিকতা বা Rationality বিদ্যমান।[7]

নারী ও পুরুষের লিঙ্গবৈষম্য মূলক ধারণা তাদের জন্মক্ষণ থেকেই পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পারিবারিক আচার আচরণ ও বিধি-নিষেধের মাধ্যমে তাদের মনে প্রোথিত হয়। একটি কন্যা শিশুকে খেলার সামগ্রী হিসাবে পুতুল ,বাসন ,থালা-বাটি ইত্যাদি দেওয়া হয়। আবার একটি পুত্র শিশুকে খেলার সামগ্রী হিসাবে দেওয়া হয় বন্দুক, গাড়ি, উড়ো-জাহাজ ইত্যাদি। অর্থাৎ কন্যা ও পুত্র শিশুদের জন্মক্ষণ থেকেই সামাজিক রীতি-নীতি, উচিত -অনৌচিত্যের পাশে আবদ্ধ করা হয়, বাইরের জগৎ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখা হয় . কন্যা শিশুটি যাতে বড় হয়ে ভাবতে না পারে যে, গাড়ি চালানো, বন্দুকের ব্যবহার, উড়োজাহাজ ওড়ানো তার কাজ ; সে কেবল ছেলেবেলার মতো ঘরের কাজ , বাসন-কোসন , সন্তান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঘরের কাজে মায়েদের সাহায্য করাই তার কাজ। অপরদিকে বাইরের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সকল প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়ভার থাকে ছেলেদের। তারা বাইরের কাজে বালকাবস্থায় পিতাকে সাহায্য করবে , বয়সকালে নিজেরা করবে। তারা কোনো ভাবেই ঘরকন্নার কাজের জন্যে দায়বদ্ধ নয়। পরিবারের এই লিঙ্গ বৈষম্যই বর্তমান সমাজে ,দেশে,তথা সমগ্র বিশ্বে অবস্থানরত নারী- পুরুষের বৈষম্যের সূত্ররেখা। যদি পরিবার থেকেই শিশু কন্যা শিক্ষা পায় যে তাকে বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক হতে হবে, তাকে অন্দরমহলের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কাজেও পারদর্শিনী হয়ে উঠতে হবে। সেই সঙ্গে একটি পুত্র শিশুকে যদি বাইরের কাজ শেখানোর সাথে সাথে অন্দরমহলের কাজেও (যথা রন্ধন,গৃহসজ্জা) উৎসাহী করা হয়, তবে আমাদের সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বে নারী-পুরুষকে এই ঘৃণ্য বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়না। নারীসমাজকেও হীনমন্যতার শিকার হতে হয়না। পুরুষদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য নারীদের আন্দোলনমুখর হিংসাত্মক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও তৈরী হয় না। বরং নারীরা তাদের কোমল, বৌদ্ধিক মনোভাবের সাহায্যে উন্নত ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই প্রসঙ্গে নারীবাদীদের বক্তব্য হলো মানুষের যৌন পরিচয়ের পরে সমাজ তার উপর লিঙ্গ পরিচয় আরোপ করে। একটি শিশু কন্যা বা একটি শিশু পুত্র থেকে ক্রমশ তার মধ্যে দেখা যায় নারীত্ব বা পুরুষত্ব।যেটি হলো Feminine এবং Masculine. নারীবাদীদের বক্তব্য হলো, নারী ও পুরুষদের মধ্যে যে বিভাজন আছে, সেটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। দৈহিক কাঠামো অনুযায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু বিভেদ থাকলেও পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ নারী ও পুরুষদের উপর বিশেষ কিছু গুণাবলী আরোপ করে। যেমন, পুরুষদের ক্ষেত্রে কিছু উৎকৃষ্ট গুণাবলী স্বীকার করা হয়। সেগুলি হলো মন(Mind),সংস্কৃতি (Culture),যৌক্তিকতা(Reason), বিষয়তা(Subject), সর্বজনীনতা (Public)। অপরদিকে দিকে নারীদের উপর কিছু গুণাবলী আরোপ করা হয়।সেগুলি হলো শরীর (Body), প্রকৃতি (Nature), আবেগ(Emotion),বস্তু(Object), ব্যক্তিগত(Private)।[8] নারীবাদীদের বক্তব্য হলো , পুরুষদের মধ্যেও কিছু গুণাবলী থাকবে। আবার নারীদের মধ্যেও কিছু গুণাবলী থাকবে। কিন্তু সমাজ গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভাজন না করে, তাদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।কিছু কিছু নারীবাদীদের মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হলো বিভাজন, পার্থক্য, পরস্পর -বিরোধিতা ও দ্বৈততা।[9] নারীবাদীরা মনে করেন,পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বিশেষ দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সে দক্ষতা সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ সামগ্রিকতা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ করে, চিন্তা করে , তাদের আশা-আকাঙ্খাও ভিন্ন।কারণ, পুরুষসুলভ ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের পৃথকভাবে ভাবতে শেখানো হয়। অর্থাৎ, নারীদের বক্তব্য হলো যৌক্তিকতা (Rationality) গুণটি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

হতে পারে। আবার আবেগ (Emotion)গুণটি পুরুষদের মধ্যেও দেখা যেতে পারে। যদি তা সম্ভব হয়, তবেই সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত হয়ে সমতার পথ প্রশস্ত হবে।

তবে সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিক কালে সরকারী এবং বেসরকারী মহলে নারীর ক্ষমতা অর্জন বা Empowerment নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বয়ং সিদ্ধা' প্রকল্পে। 'স্বয়ং সিদ্ধা' - এই সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে রয়েছে একটা অর্জনের দ্যোতনা এবং স্বনির্ভর হয়ে ওঠার একটা প্রতিশ্রুতি। ২৯ শে নভেম্বর ২০০১ সালে দিল্লিতে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ঘাটিত হয়।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের পাশাপাশি একটি স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যের তালিকাও এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত। এই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যগুলি হলো -

ক) স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী নির্মাণ

খ) এই গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো ও তাদের সজাগ করে তোলা

গ) গ্রামীণ মহিলাদের সঞ্চয়ের অভ্যেস তৈরি করা

ঘ) মহিলাদের জন্যে ক্ষুদ্র ঋণ সহজলভ্য করা এবং

ঙ) স্থানীয় উন্নয়নের কর্মসূচিতে মহিলাদের সামিল করা।

এছাড়াও বর্তমান সময়ে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প ও কেন্দ্রীয় সরকার ‘বেটি বচাও বেটি পঢ়াও’ প্রকল্পগুলি চালু করেছেন।

সমাজে যে লিঙ্গভেদে বৈষম্য, তা মানবাধিকারের পরিপন্থী। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতার ও অধিকারের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সমান। অথচ পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারী শাসন-পীড়ন-অত্যাচার-নিগ্রহের নির্মম শিকার। অথচ ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতা। সারাপৃ থিবী তার দিকে তাকায় সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে। অতি প্রাচীন কালেই, সেই সভ্যতা নারীর স্থান এবং তার মর্যাদা কে দিয়েছিলো সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

ব্রহ্মবাদিনী অপালা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, গার্গী , বিশ্ববারা প্রমুখ মহিয়সী নারীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সেই সভ্যতাকালে বেদের আলোকিত বিদ্যাতেও ছিল তাঁদের সমান অধিকার। উপবীত-ধারণে এবং বৈদিক মন্ত্র রচনায় তাঁরা স্মরণীয়া হয়ে আছেন। বৌদ্ধ যুগেও সুজাতা ,সুপ্রিয়া , সঙ্ঘমিত্রার নাম ইতিহাসে আজও ভাস্বর।

বর্তমান যুগে মানবজাতি বিজ্ঞান,সাহিত্য,কলা ইত্যাদিতে চরম আধুনিকতায় উন্নীত হয়েছে , গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দিয়েছে ,অথচ এই যুগেও নারী জাতিকে পণপ্রথা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি নৃশংসতার শিকার হতে হচ্ছে। বিবাহ একটি অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। এর দ্বারা পরিবার সংগঠিত হয় এবং এই পরিবারই ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। বিবাহে এবং পরিবারে পুরুষ ও নারীর সমান গুরুত্ব এবং সমান মর্যাদা। কিন্তু , এই পুরুষ-শাসিত, পুরুষ-প্রধান সমাজে পণপ্রথা আজও বিদ্যমান। বহু আদর্শহীন যুবক,এমনকি বহু পরিবার বিবাহকে একটি লাভজনক ব্যবসা রূপে মনে করে। বিবাহের পণ অনাদায়ে চলে অসহায় বধূর উপর অকথ্য অত্যাচার , দৈহিক ও আত্মিক পীড়ন, যার পরিসমাপ্তি ঘটে নৃশংস হত্যায় কিংবা দুঃসহ আত্মহত্যায়। বিকৃত পৈশাচিক পণ প্রথাই সমাজে নৃশংস কন্যা ভ্রূণ হত্যার ধারক ও বাহক।

তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে নারীরাও পুরুষের কর্তৃত্ব সমর্থন করে। তাদের সহযোগিতা ছাড়া পিতৃতন্ত্র বহাল থাকতেই পারতোনা । উদাহরণস্বরূপ যেমন স্থানীয় সৈন্য ও পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতা ছাড়া গুটিকয় ইংরেজ শাসকদের পক্ষে এক-একটি বিশাল দেশ বা মহাদেশে রাজত্ব করা সম্ভব হতোনা। ক্রীতদাসদের পরোক্ষ সমর্থনেই ক্রীতদাস প্রথা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের 'আপস নীতি'র কারণেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে পিতৃতন্ত্র প্রাধান্য পেয়েছে। আজ যদি নারীরা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়ে , আত্ম পরিচয়ের সঙ্কটমোচনে নিজেরা বিচ্ছিন্ন না থেকে সংগঠিত হয়ে, নারীর সাথে নারীর যোগাযোগ যদি আরো বেশি হতো, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যদি বাড়তো , যদি তারা আন্তরিকভাবে পরস্পরের হাতে সহযোগিতার হাত রাখতো , নারীর ক্ষমতায়নে এক নারী আরেক নারীর পাশে দাঁড়াতো , তবে নারী জাতি পুরুষ তন্ত্রের কাছে অবদমিত হয়ে থাকতো না। নারী-পুরুষ ভেদে যে বৈষম্য বা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় - তা হলো শারীরিক দিক থেকে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে নারী-পুরুষের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নারী- পুরুষ উভয়েই মানুষ। অতএব , মানুষ হিসাবে উভয়েই সমান। সমাজের তথা পরিবারের পুরুষ নির্ধারিত সকল কাজই নারীরা অবলীলায় করতে পারে। অথচ পুরুষ শাসিত সমাজ, নারীকে তার ভাগ্য জয় করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। তাই আজও ভারতীয় নারীর অসহায় কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- ''নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?''। [10] তা সত্ত্বেও নারীরা সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে - দেশের প্রধানমন্ত্রী , রাষ্ট্রপতি,মুখ্যমন্ত্রী,প্রধান বিচারপতি, বিশ্বের সফলতম বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ,পাইলট,এঞ্জিনিয়র,চিকিৎসক,শিক্ষিকা-অধ্যাপিকা,মহাকাশচারী ছাড়াও ক্রীড়াজগৎ, ক্রীড়াকলা, অভিনয়, পর্বতারোহণ - প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। নারী বা পুরুষ- কোনো একটির অভাবে যেমন সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হয়, তেমনি নারী ও পুরুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই কোনো মহান কার্য সম্পাদিত হয়।

তবে, সমাজে যে শুধুমাত্র নারীরা স্বীকৃত- তা নয়।আবার যে শুধুমাত্র পুরুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়- তাও নয়। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ- উভয়ের সাহচর্যেই সুন্দর সমাজ গঠিত হয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, দু'চাকা বিশিষ্ট গাড়ি যেমন সামনের দিকে এগিয়ে যায় দুটি চাকার সমান ভারসাম্যের ফলে, কোনো একটি চাকা যদি না থাকে, তবে গাড়িটির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।সেক্ষেত্রে গাড়িটি তার চলন ক্ষমতা হারাবে। ঠিক তেমনি আমাদের সমাজ গঠিত হয় নারী ও পুরুষ- উভয়ের দ্বারা। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের উভয়ের গুণাবলীর দ্বারাই এই সমাজ সুন্দরভাবে সংগঠিত হয়।নারী বা পুরুষের মধ্যে কোনো একটির অনুপস্থিতির ফলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। অর্থাৎ সমাজে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য নারীকে যেমন বৌদ্ধিক বা Rational হতে হবে , আবার Emotion বা আবেগ গুণটিকেও পুরুষের মধ্যে স্বীকার করতে হবে। বাইরের কাজে যেমন নারীদের আগ্রহী করতে হবে, তেমনি গৃহস্থালির কাজেও পুরুষদেরও সমানভাবে উৎসাহিত করতে হবে। তবেই সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানগত দ্বন্দ্ব দূরীভূত হবে। নারী ও পুরুষ যে উভয় উভয়ের পরিপূরক, তা তারা ক্রমশ অনুভব করতে শিখবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সমাজে নারী ও পুরুষের ভুমিকা হবে একই মুদ্রার দুটি দিকের মতো। (They are two sides of a coin)।

মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যের' উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন—

'' বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণ-কর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'' [11]

....

তথ্যসূত্র

1. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় , ''রাজনীতিতে নারী'', 'নারীশ্রেণী ও বর্ণ ,নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান', ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া,হাওড়া , ২০০০,পৃ.১২৬-৭

2. Francis Macdonald Cornford, The Republic of Plato, Oxford University Press, London, 1969,lll.395.

3 . শেফালী মৈত্র, ‘’নৈতিকতা ও নারীবাদ’’, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা,পৃ.৩০

4. নবকুমার নন্দী ও মানিক বল, ''ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান'',শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কোলকাতা- ৭০০০০৯

5. John J. Goldthwait, Observations on the Feelings of the Beautiful and Sublime, University of California Press, 1960, p.79.

6. John J. Goldthwait, Observations on the Feelings of the Beautiful and Sublime, University of California Press, 1960, p. 93.

7. শেফালী মৈত্র, ‘’নৈতিকতা ও নারীবাদ’’, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা,পৃ. ৪৩-৪৯

8. Kamala Bhasin, ”Understanding Gender”,Women Unlimited,New Delhi,2008. Pp. 15-16.

9. কমলা ভাসীন, ’’পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?’’ স্ত্রী প্রকাশনী, কোলকাতা, পৃ.১১

10. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,’রবীন্দ্র রচনাসমগ্র’,’মহুয়া’,’সবলা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলিকাতা, ২৩শে অগস্ট,১৯২৮

11. কাজী নজরুল ইসলাম,‘সঞ্চিতা’,‘নারী’, ডি. এম লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণী/ কলকাতা- ৭০০০০৬

গ্রন্থপঞ্জী

Acker, J. "Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist Research." Women's Studies International Forum 6 (1983): 423-35.

Anderson, K., S. Armitage, D. Jack, and J. Wittner. "Beginning Where We Were: Feminist Methodology in Oral HIstory." Oral History Review 15 (1987): 103-27.

Ballif, Michelle, Diane Davis, and Roxanne Mountford. Women's Ways of Making it in Rhetoric and Composition. New York: Routledge, 2008.

Barry, K. "Biography and the Search for Women's Subjectivity." Women's Studies International Forum 12 (1989): 561-77.

Bazerman, Charles, and James G. Paradis. Textual Dynamics of the Professions: Historical and Contemporary Studies of Writing in Professional Communities. Madison: University of Wisconsin P, 1991.

Berg, B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Allyn and Bacon, 1995.

Blau, F. D. "On the Role of Values in Feminist Scholarship." Sign 6 (1981): 538-40.

Bowles, G., and R. D. Klein, eds. Theories of Women's Studies. London: Routledge and Kegan, 1983.

Bowles, G. "The Uses of Hermeneutics for Feminist Scholarship." Women's Studies International Forum 7 (1984): 185-88.

Bowles, G. "The Uses of Hermeneutics for Feminist Scholarship." Women's Studies International Forum 7 (1984): 185-88.

Brinton Lykes, M. "Discrimination ad Coping in the Lives of Black Women: Analyses of Oral HIstory Data." Journal of Social Issues 39 (1983): 79-100.

Bunkers, Suzanne. ""Faithful Friend": Nineteenth-Century Midwestern American Women's Unpublished Diaries." Women's Studies International Forum 10 (1987): 7-17.

Burt, Sandra, and Lorraine Code, eds. Changing Methods: Feminists Transforming Practice. Ontario: Broadview P, 1995.

Clegg, S. "Feminist Methodology: Fact or Fiction." Quality and Quantity 19 (1985): 83-97.

Cook, J. A., and M. M. Fonow. "Knowledge and Women's Interests: Issues of Epistemology and Methodology in Sociological Research." Sociological Inquiry 56 (1986): 2-29.